যায়যায়দিন

তারিখ ২৫/১/২০১০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বিশ্বায়নের ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রভাবনীয় অগ্রগতি হচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে এবং দেশের মানুষকে উন্নততর শিক্ষা প্রদান করে বিশ্বের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে হলে জাতীয় শিক্ষাকে ঢেলে সাজিয়ে তা উন্নত দেশের সঙ্গে মানানসই করতে হবে। তবে এ কথা অবশ্যই লক্ষণীয়, শিক্ষানীতির পরিবর্তন সংখ্যাগত (quantitative) ফলের প্রত্যাশায় করা বাঞ্ছনীয় হবে না। এর ফলে শিক্ষার গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধন হওয়া প্রয়োজন, তবেই এ নীতির 'যথার্থতা প্রমাণ' হবে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার যে শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেছে, তা মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই ছিল এবং এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের জীবনী বাতিল ও সংযোজন ছাড়া তেমন কোনো নতুনত্ব দেখা যায়নি। শিক্ষাব্যবস্থায় তথা এসএসসি ও এইচএসসির পরীক্ষা ও পঠনের কৌশলের ক্ষেত্রে সৃজনমূলক থেকে নৈবৃত্তিক পরীক্ষার এবং শ্রেণী বিভাগ থেকে লিপিএতে পরিবর্তন দেখা গেছে। এর ফলে একজন এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে আগের তুলনায় কী পরিমাণ মানগত ও গুণগত উন্নয়ন সাধন হয়েছে, তা বলা সম্ভব না হলেও জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং পাসের হারের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সেদিক বিবেচনায় আমাদের একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, এ শিক্ষানীতিটির প্রয়োগ যথাযথ হবে এবং এর ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। গুণগত বিষয়টি একজন গ্র্যাজুয়েটের দক্ষতা ও জ্ঞানগত উন্নয়ন দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা বিদেশি বাজারে White color লড়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে কতোটুকু প্রযোগী বা সফল হচ্ছে তার দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। কারণ বিশ্ববাজারে আমাদের দক্ষশক্তি শুধু Blue Color লড়নের জন্য প্রযোগী। কিন্তু আমাদের পাশের দেশ ভারত, কিন্তান বা ফিলিপাইনের শিক্ষাব্যবস্থার মান অনেকটাই উন্নত হয়েছে, যার ফলে তারা দক্ষ দক্ষশক্তি পশ্চিমা দেশগুলোতে রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছে।

২ পৃষ্ঠার খসড়া শিক্ষানীতি ২০০৯-এর পর্যালোচনার শুরুতে এর সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা দেয়া প্রয়োজন। প্রথমেই এর ইতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করছি :

১) সব ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

২) সব ধরনের (মাদ্রাসা, স্কুল ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল) শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ও বিষয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আনা হয়েছে।

৩) প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে উন্নীত করে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে।

৪) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও মনশীলতার বৃদ্ধিসহ চিত্তের উন্নয়নের লক্ষ্যে ন ও পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর দেয়া হয়েছে।

৫) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর য়া হয়েছে।

৬) শিক্ষা উপকরণ ও ভৌত অবকাঠামো ওপর করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৭) দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা নীতি, ব্যবসায়, প্রযুক্তি ও করাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (যদিও কোথায় বা কী পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, সে রকম কোনো দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়নি)।

(১৯) শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে তাদের জন্য ভিন্ন বেতন কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

(২০) বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবনীয়, শিক্ষানীতি ২০০৯ অনেকাংশেই সার্বিক ও যুগোপযোগী। তবে এতে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব অর্থায়নে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপসহ গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষার মান ও কৌশলকে পুরোপুরি পাশ কাটানো হয়েছে। বস্তুতপক্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সফলতা ও সার্বিক মান নির্ভর করে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের ওপর। আর উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি গবেষণাধর্মী ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা না যায় তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা বাস্তবে কখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। হয়তো কোর্স কারিকুলামে চারটির জায়গায় পাঁচটি কোর্স এবং পঞ্চম শ্রেণীর জায়গায় অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিক্ষানীতি ২০০৯-এর গঠনমূলক সমালোচনার শুরুতেই এর দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে :

(১) মাধ্যমিক পর্যায়ের পঠন কৌশল (Teaching Methodology), সৃজনশীল ও যুক্তিবাদমূলক মূল্যায়নের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

(২) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে (Teaching methodology) কেমন হবে, এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে এবনো পুরনো পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বর্তমানে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে শিক্ষার পাশাপাশি নোট পঠনের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার প্রচলন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিষয় যেমন বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় প্রজেক্ট, কেসস্টাডি, ব্যবহারিক, অ্যাসাইনমেন্টের (Term paper) প্রচলন থাকলেও তার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা না থাকায় এর মানও অত্যন্ত নিম্ন, ফলে একজন শিক্ষার্থী প্রয়োগিক জ্ঞান (Problem Solving capacity) ও দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি তিন বছরের জায়গায় চার বছর করার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠন কৌশলের ওপরও জোর দেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে Aalborg Teaching pedagogy-(PBL- Problem Based Learning) ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বাজেট বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব অর্থায়নের ওপর

চিন্তা-চেতনা ও পাঠদানের যোগ্যতা ইত্যাদি নির্ভর করে উচ্চশিক্ষার স্তরে তাকে কীভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রণীত খসড়া শিক্ষানীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে গেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক দরকার, যাদের মান নির্ভর করবে উচ্চশিক্ষার মানের ওপর। বর্তমানে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা প্রণীত শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। ফলে এই শিক্ষানীতি একটি কাগুজেনীতিতে পরিণত হবে যদি প্রথমেই ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা ও উচ্চশিক্ষার মানকে নিশ্চিত করা না যায়। এর পরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে যে প্রচলিত অনুশীলন তা হলো প্রতিটি স্তরেই প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির সুবিধার ব্যবস্থা না করেই বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে দেয়া। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয়, ভালো সিলেবাস থাকলেই ভালো পড়াশোনা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে তা স্বপ্নই থেকে যায় এবং পরে হতাশায় রূপ নেয়। গুণগতমান ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের ঘাটতি শুধু স্কুল ও কলেজ পর্যায়েই নয়, তা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা তাদের শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেছেন। কিন্তু ভালো শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো প্রচলিত উচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন চালু নেই।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তিনটি দেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, যুক্তরাজ্যে যেমন স্কুল শিক্ষাকে জোর দেয়া হয়েছে, তেমনি উচ্চশিক্ষার (বিশ্ববিদ্যালয়) ক্ষেত্রেও গবেষণা ও পাঠদানের মানকে (Teaching Pedagogy quality) সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের স্নাতক ডিগ্রির প্রচলন রয়েছে। যেমন স্কটল্যান্ডে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি সেসব বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ওইসব কোর্স পড়ায় এবং এমনভাবে পড়ায়, যাতে পাস করলেই গ্র্যাজুয়েটরা চাকরির বাজারে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ায় Teaching method-এর ওপর পড়াশোনার সুযোগে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল। সেখানেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বিশেষ করে স্নাতক পর্যন্ত দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Competency Based Teaching -CBT) চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি কোর্সের সুনির্দিষ্ট দক্ষতা উল্লেখ করা রয়েছে, যা একজন ছাত্র ওই কোর্সটি সম্পন্ন করার পর অর্জন করবে, তবেই তাকে ডিগ্রি দেয়া হবে। এ বিবেচনায় দেখা যায়, ওইসব দেশে দক্ষতাসম্পন্ন ভালো শিক্ষক পাওয়া কোনো সমস্যা নয়, যার ফলে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা অনেকটাই সহজ। কিন্তু আমাদের শিক্ষানীতিতে যে ভারসাম্যহীন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, এর ফলে যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ভালো শিক্ষকের ঘাটতি ও গবেষণাবিমুখ উচ্চশিক্ষার প্রভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনানীতি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন, শিক্ষকদের জন্য যে ভিন্ন ও উন্নতর বেতন কাঠামোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার যথার্থ বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই এ পরিকল্পনার সফলতাকে প্রভাবিত করবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্ররাজনীতি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতি (নীল, সাদা ও গোলাপি) করার যে প্রভাব গবেষণা ও ক্লাস নেয়ার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তা দূর করা না গেলে এই শিক্ষানীতির কোনো যথার্থতা থাকবে না।

রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, ক্লাস বন্ধ, চাঁদাবাজি ইত্যাদির যে কুপ্রভাব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পরিলক্ষিত হয়, তা সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অনেকটাই পরিপন্থী। স্কুল ও কলেজগুলোতে (বেসরকারি) রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রভাব ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার বিষয়টিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অনেক শিক্ষকেরই সঠিক নীতিমালা পালনের ক্ষেত্রে বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

তাই সবচেয়ে প্রথমে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা (Commitment) ও শিক্ষাকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করতে হবে। তারপর ভৌত ও প্রযুক্তি অবকাঠামো নিশ্চিত করে এই শিক্ষানীতিতে 'উচ্চশিক্ষার' বিষয়টিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু সরকারি দল নয়, বিরোধী দল তথা সব শিক্ষক সমাজকেও এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এবং সে সঙ্গে এর দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে পারলে এই শিক্ষানীতি অনেকাংশেই সফল হবে।

মো. বখতিয়ার রানা: সহযোগী অধ্যাপক, চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।